

## দ্বিতীয় অধ্যায় ইতিহাস প্রথম পরিচ্ছেদ সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

### বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ইতিহাস

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে যে বিরাট ভূখণ্ড রয়েছে তা ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিতি ছিল। এ উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দেশের নাম ছিল বঙ্গদেশ। সে বঙ্গদেশের পূর্ব অংশই আজকের বাংলাদেশ। এ হিসেবে কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের যে ঐতিহ্য বাংলাদেশের জনগণ তারই অংশীদার। তবে সংগীতে বাংলাদেশের একান্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তার লোকসংগীতের মধ্যে।

প্রাক-মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশে চর্যাগীতি, নাথগীতি, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি নানা প্রকারের গান প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতি ছিল বৌদ্ধ ধর্মোচারণের সাধনসংগীত। নাথগীতি ছিল যোগী নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। গীতগোবিন্দ ছিল কবি জয়দেব রচিত গীতিকাব্য তথা গীতিনাট্য। উপর্যুক্ত প্রকারের গানগুলোর রচনা ও প্রসার ঘটে খ্রিস্টীয় ৬৫০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে। অতঃপর সেগুলোর অনুশীলন ক্রমান্বয়ে অপ্রচলিত হয়ে যায়।

মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে যে রীতির গানের প্রচলন ছিল তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গাওয়া হতো গীতিনাট্য আকারে পায়ে ঘুড়ুর বেঁধে নৃত্য সহযোগে।

এরপরে প্রাক-মধ্যযুগের গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসরণে রচিত হয় এক প্রকার সাহিত্য। এর নাম পদাবলি। রচয়িতাদের বলা হয় পদকর্তা। ইতিহাসে অনেক পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তাঁদের কয়েক জনের নাম বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, বলরাম দাস, মনোহর দাস, হরহরি চক্রবর্তী।

পরবর্তীকালে ষোড়শ শতকে যে কীর্তন গানের সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে ছিল এই পদাবলি কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে কীর্তন গানের সম্পর্ক তেমন ছিল না। পদাবলি গায়নের ব্যাপক অনুশীলন ও বিস্তার ঘটে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। তখন থেকে এর নাম হয়ে যায় কীর্তন। বৈষ্ণব পদাবলি আর পদাবলি কীর্তন এক কথা নয়। অঞ্চলভেদে পদাবলি কীর্তনের গায়ন রীতিরও পরিবর্তন ঘটে। সেসব আঞ্চলিক গায়নরীতির নাম মনোহর শাহী, রানীহাটি বা রেনেটি, মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী।

চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলগীতি নামে আরেক প্রকার গান বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই গানের ভিত্তি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাকল্পে রচিত মঙ্গলকাব্য।

এরপর নাম করতে হয় শাক্ত পদাবলি বা শাক্তগীতির। এ গান শ্যামাসংগীত নামে পরিচিত। এ গীতিধারা খুববেশি প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতকে।

১৭৮৫ সাল থেকে শুরু হয় বাংলাগানের আধুনিক যুগ। বঙ্গদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেসব রীতির গান ছিল তার সবই ধর্ম বিষয়ক অর্থাৎ ভক্তি রসাত্মক। এসব গানে মানুষের মনের সব চাহিদা মেটেনি। সেসব চাহিদা মেটাতে

রচিত হতে শুরু করল আরেক ধারার গান। এ গান বাংলা টপ্পা নামে চিহ্নিত। কারণ পাঞ্জাব প্রদেশের টপ্পারীতির গানের অনুসরণে এ গান রচিত। এ গান রচিত হয় প্রথমত রামনিধি গুপ্ত এবং দ্বিতীয়ত কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। তারা নিধুবাবু এবং কালী মির্জা নামে পরিচিত। এঁদের গানে এলো ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয় এবং ভক্তিরসের বাইরে ভিন্ন রস। সুরের মধ্যেও এলো ভিন্ন রূপ।

অষ্টাদশ শতকেই বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হয় আরও কিছু নতুন প্রকৃতির গান। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাত্রা ও কবিগান। তখনকার যাত্রা ছিল পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত গীতি প্রধান নাটক। আর কবিগান ছিল কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে দুই কবির লড়াই। এরা তাত্ক্ষণিকভাবে রচিত কবিতাকে গানের মতো করে গেয়ে একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করতেন। যাত্রা এবং কবিগান এখনও জনপ্রিয়। সে যুগের কয়েকজন বিখ্যাত যাত্রা-পালাকারের নাম হলো গোবিন্দ অধিকারী, শিশুরাম, লোচন অধিকারী। যাত্রা গানেরও নানান প্রকার ছিল যেমন— বড়ো যাত্রা, ভাসান যাত্রা, নিমাই যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা। সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবিরামের নাম হলো— ভোলা ময়রা, রামবসু, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। অতপর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা সংগীত হিসেবে আসে ব্রহ্মসংগীত। বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গান হলেও এ গান শিক্ষিত ভদ্র সমাজে সাদরে গৃহীত ও অনুশীলিত হতে থাকে। প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচয়িতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় এবং সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রহ্মসংগীতের রচনারীতি পরবর্তী অনেকের রচনায় প্রভাব বিস্তার করে। যেমন— রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখের গান।

বাংলাগানের ভুবনে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত যাঁদের রচনা উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম ও মুকুন্দ দাস। এঁদের সবাই ছিলেন বাগ্গেয়কার অর্থাৎ নিজে গান বেঁধে নিজে গাওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অতীতেও বাংলাগানের রীতি প্রবর্তনে ও উন্নতি সাধনের পিছনে ছিলেন বাগ্গেয়কার। রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায়, মধুসূদন কিন্নর, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রমুখ ছিলেন বাগ্গেয়কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মুকুন্দ দাস পর্যন্ত যে ছয় জন বাগ্গেয়কারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের গান বাঙালি শ্রোতার বড়ো প্রিয়। এঁদের গানের বিষয়বৈচিত্র্য, সুরমাধুর্য শ্রোতার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এঁদের গানের মাধ্যমে আমরা অতীতের গানের নমুনাও পাই। এঁদের গানে বাংলাগানের ভবিষ্যত রূপটিও যেন বেঁধে দিয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে বাংলা আধুনিক নামে যে গানের প্রচলন হয় তাতে আছে উক্ত ছয় জনেরই প্রভাব। তাঁদের প্রভাবেই অস্বীকার করে এখন পর্যন্ত কেউ বাংলাগানের কোনো রচিকর উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি।

বাংলাগানের ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীতের আলোচনাও চলে আসে। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গানের শুরুতে রাগনাম উল্লেখ থাকত বটে তবে তার দ্বারা এ প্রমাণিত হয় না যে, তখন শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা হতো। এ ধরনের উল্লেখ ছিল প্রথাগত ব্যাপার মাত্র। শাস্ত্রীয়সংগীত বলতে বর্তমানে যে প্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা বোঝায় নিধুবাবুর আগের রচয়িতাদের গান তার কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। কলি বা স্তবকে ভাগ করে রচিত হতো বলে এগুলোর কোনো কোনোটাকে বড়ো জোর প্রবন্ধগীত বলা যেতে পারে।

বাংলার মাটিতে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে; প্রথমত রামনিধি গুপ্ত ও কালী মীর্জা রচিত টপ্পাশৈলীর গানের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রুপদ ও খেয়ালের মাধ্যমে। ক্রমে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা সম্প্রসারিত হয় স্থানে স্থানে। সেসব স্থানের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, গৌরীপুর, মুন্সীগঞ্জ ইত্যাদি স্থানের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি এবং আরও পরবর্তীকালে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ চর্চায় বিশেষ করে ঠুমরি চর্চায় আরও বেশি ইন্ধন যুগিয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ'র দরবার। এ দরবারেই ঠুমরি গানের চর্চা হতো।

### লোকসংগীত

বাংলাগানের ঐতিহ্য বিষয়ে এ যাবৎ যে যে প্রকৃতি ও রীতির গানের উল্লেখ করা হলো তারই পাশাপাশি লোকসংগীতের আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। লোকসংগীতের ধারাবাহিকতা এমনই যে, কোনো শতক বা যুগ দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না; তা আবহমানকালের সম্পদ। লোকসংগীতকে সুরকাঠামো ও গায়ন ভঙ্গির নিরিখে ভাগ করা হয়েছে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি, বাউল ইত্যাদি নামে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এগুলো বিভিন্ন নামে চিহ্নিত। এসব গানের প্রবর্তক হিসেবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না, তবে কখনো কখনো কোনো কোনো গানের রচয়িতার নাম জানা যায় মাত্র। একাধিক গানের রচয়িতা হিসেবে কারও নাম পাওয়া গেলে তখন ব্যক্তি নামে চিহ্নিত করে বলা হয়— সৈয়দ শাহনূরের গান, লালনের গান, হাসন রাজার গান, পাগলা কানাইয়ের গান, বিজয় সরকারের গান, শিতাল শাহের গান, উকিল মুন্সীর গান, রশিদ উদ্দিনের গান, মনমোহন দত্তের গান, রমেশ শীলের গান, মহেশচন্দ্রের গান, মোমতাজ আলী খানের গান, আবদুল লতিফের গান, ভবা পাগলার গান, কালুশাহের গান ইত্যাদি। বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকার গানের ওপর পড়লেও এ সংগীতের ওপর বহিরাগত গানের প্রভাব খুব কমই পড়েছে।

উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

### জারি

বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি অন্যতম সম্পদ হলো জারিগান। জারি শব্দের অর্থ শোক বা কান্না। জারিগান সমবেত সংগীত। প্রায় ১০-১২ জনের একটি দল গঠিত হয়। প্রধানত কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হয়। শুধুমাত্র কারবালা প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে জারিগান রচিত হতে দেখা যায়।

একটি গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো:

কাসেম, যায়রে- যুদ্ধে যায় চলিয়া,  
সখিনা বিদায় দিল হাসিয়া কান্দিয়া,  
কাসেম যায় যায়রে.....।



### সারি

সারি গান বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি গান। এটি মূলত নৌকা বাইচের গান। এদিক বিবেচনায় সারি গান কর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। নৌকা বাইচের সময় সারি গান পরিবেশিত হয়। সিলেটের হাওড় অঞ্চল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও পাবনা জেলা নৌকা বাইচের জন্য প্রসিদ্ধ। একটি প্রচলিত সারি গান তুলে ধরা হলো: সোনার বান্ধাইলে নাও, পিতলের গুরা রে, ও রঙ্গের ঘোড়া দোড়াইয়া যাও।

### বিচ্ছেদী

যে গানের বাণী ও সুরে প্রিয়জন হারানোর বেদনা, করুণ সুর প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে তাকেই বিচ্ছেদী গান বলা হয়। মানবজীবনভিত্তিক এ গান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকসমাজে প্রচলিত আছে। শরিয়ত, মারফতি গানে অধরাকে ধরার জন্যে ব্যাকুল ভাব এই গানে পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিচ্ছেদী গান নিম্নরূপ:

তোমারো লাগিয়ারে  
সদাই প্রাণ আমার কান্দে বন্ধুরে,  
প্রাণ বন্ধু কালিয়ারে'।

### বারোমাসি

বারোমাসি গান লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা যা সাধারণ মানুষের কাছে বারোমাস্যা নামে পরিচিত। বছরের বারো মাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা বারোমাসি গানে বর্ণনা করা হয়। এই গান গুরুত্বপূর্ণ হয় সাধারণত বৈশাখ মাসের বর্ণনা দিয়ে এবং শেষ হয় চৈত্র মাসের বর্ণনা দিয়ে। বারোমাসির গানগুলো বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে প্রচলন বেশি। বাংলাদেশে প্রচলিত বারোমাসি গানের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আইলো  
গাছে পাকা আম  
আমি কাহার মুখে রস লাগাইতাম  
ঘরে নাই মোর শ্যামরে।

### টুসু

টুসুগান মূলত পূজার গান। এই গান পৌষ মাসে গীত হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, কুচবিহার এই অঞ্চলে টুসুগান বিশেষভাবে প্রচলিত। একটি টুসুগান তুলে ধরা হলো:

ওলো তোরা টুসু লিহে যাসনে বাঁধেলো  
ঐ বাঁধেতে ভূত আছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সংগীতগুণীদের জীবনী

### আমির খসরু (১২৫২—১৩২৫)

মধ্যযুগে সংগীতের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল। তাঁর দরবারে অন্যতম সংগীতকার ছিলেন আমীর খসরু। আমীর খসরু ভারতে আগমনকারী একটি সম্ভ্রান্ত তুর্কি পরিবারে উদ্ভূত প্রদেশের পাতিয়ালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈফুদ্দীন লাচিন তুর্কিদের একজন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। আমীর খসরু একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, গীতরচয়িতা, সংগীত শিল্পী, দার্শনিক, মরমী সাধক এবং যোদ্ধা। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি উর্দু ভাষা প্রচলনে সাহায্য করেন। খসরু 'গজল', মসনবী, কাসিদা, রুবাইৎ এবং নানা ধরনের কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। আমীর খসরুর মাতৃভাষা পারসি, তুর্কি, আরবি, হিন্দি ও সংস্কৃতও দখল ছিল। মুসলমান আমলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতে মিশ্রণের দ্বারা সৌন্দর্য সম্পাদন। আমীর খসরুকে এ ব্যাপারে পুরোধা বলা চলে। মূল ভারতীয় রাগকে পারস্য সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তিনি রাগের পারসি নামকরণের প্রথাও চালু করেন। সুর মিশ্রণে আমীর খসরু বারোটি রাগের সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। তিনি ইমন এবং বসন্ত রাগ রচনা করেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বলেছেন যে, আমীর খসরুই ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপাল, ইমন-কল্যাণ, ঝিঝোঁটি প্রভৃতি নতুন রাগের সৃষ্টি করেন। যন্ত্রসংগীতেও আমীর খসরুর অবদান উল্লেখযোগ্য। সেতার এবং তবলার আকৃতি ও বাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। আমীর খসরু এবং তাঁর শিষ্যরা যে গান গাইতেন তাকে 'কাওয়ালি' বলা হয়।

### গুস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (১৯০৩—১৯৫৯)

গুস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯০৩ সালে ২ এপ্রিল কুমিল্লায় (শহরের বিখ্যাত দারোগা বাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাইদুল হোসেন এবং মাতার নাম আফিয়া খাতুন। তাঁদের আসল বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা গ্রামে। মোহাম্মদ হোসেন খসরুর পিতা একজন বিশিষ্ট বংশীবাদক ছিলেন। তিনি খুব ভালো বাঁশি বানাতেও পারতেন। শৈশব হতেই মোহাম্মদ হোসেনের সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতার কাছে বাঁশি বাজানো শিখেন। গুস্তাদ জানে আলম চৌধুরী ছিলেন তখনকার দিনে কুমিল্লার প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সম্পর্কে মোহাম্মদ হোসেন খসরুর নানা। মোহাম্মদ হোসেন বাঁশি ছেড়ে নানার কাছে কণ্ঠসংগীতের তালিম নিতে শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একজন পরিপূর্ণ শিল্পীরূপে মোহাম্মদ হোসেন খসরুর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মোহাম্মদ হোসেন খসরু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি দুইটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। এত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারেননি। তিনি এম এ প্রথম পর্বে এবং আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি লাভ করেছিলেন।

## ইতিহাস

তার স্মৃতিশক্তি এবং সুরজ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যা শুনতেন, তা অতি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলতেন। স্মৃতি শক্তি এবং একাত্মতা ছিল তার সংগীত সাধনায় সফলতার অন্যতম কারণ।

অসাধারণ মেধা ও সাধনার বলে মোহাম্মদ হোসেন একজন গুণী সংগীতশিল্পী হয়ে উঠলেন। ১৯২৮ সালে মোহাম্মদ হোসেন খসরু শাস্ত্রীসংগীতে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মৌ যান। ত্রিপুরার মহারাজ তার সুনাম শুনে তাকে দরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বেনারস থেকে আগত মিশিরজি নামে দুই ভাই সংগীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন। তারা মোহাম্মদ হোসেনের গান শুনে খুব তারিফ করেন এবং তাঁকে বেনারসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খানও ত্রিপুরার রাজদরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য রামপুর থেকে এসেছিলেন। ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খান খসরুর গান শুনে খুশি হয়ে তাঁকে সাগরদেব করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মেহেদী হোসেন খাঁর কাছেই কোলকাতায় মোহাম্মদ হোসেন খসরু নাড়া বেঁধে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি লক্ষ্মৌ, বারানসী (বেনারস) ও দিল্লীর অনেক সংগীতগণিদের নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি প্রভৃতি গানের তালিম নেন। মোহাম্মদ হোসেন খসরুর যেমন বহুমুখী সংগীত প্রতিভা ছিল, তেমনি বহুমুখী তালিমও তিনি লাভ করেন। গুরু মেহেদী হোসেন খাঁর কাছে তিনি ধ্রুপদ, 'ধামার', 'সাদা' ও 'হোরী' অঙ্গের রাগ-রাগিণীর তালিম নেন। লক্ষ্মৌ দিল্লী, রামপুর, আত্রা ও বেনারসে অবস্থানকালে ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁর কাছে ধ্রুপদ; ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ, ওস্তাদ মোহাম্মদ আলী খা, জান বাঈ, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়াল এবং ঠুমরির তালিম নেন ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও ওস্তাদ মঈজুদ্দিন খাঁর কাছে। তিনি ওস্তাদ মসিত খাঁর কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি কিছুদিন লক্ষ্মৌর বিখ্যাত 'মরিস কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠানে সহ-অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ হোসেনের ডাক নাম ছিল 'খোরশেদ'। আমিরুল ইসলাম শকী নামে তার এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু ছিলেন।

শকী সাহেব বন্ধু খোরশেদের মধ্যে বিখ্যাত সংগীতবিদ আমীর খসরুর গুণাবলির পরিচয় পেয়ে 'খোরশেদ' নাম বদলে 'খসরু' রাখলেন। তখন থেকে তিনি 'খসরু' নামে পরিচিত হতে লাগলেন। তাঁর রচনা ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে অনেক গান ও গজল রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন গানপাগল ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। গানের আসরে বসলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাইতেন।

মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯৩২ সালে সমবায় বিভাগে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। সরকারি এ চাকরিতে তিনি প্রথমে নারায়ণগঞ্জ ও পরে ময়মনসিংহে কর্মরত ছিলেন। সেকালে ময়মনসিংহ ছিল বিখ্যাত সংগীতকেন্দ্র। সেখানকার মুজাগাছা, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, কালীপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারের সংগীত দরবারসমূহ সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতগণিদের দ্বারা অলংকৃত থাকত। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর ময়মনসিংহে থাকার সময়টি তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দময় ছিল। এ সময়ে বিভিন্ন দরবারে গান পরিবেশন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৩ সালে নারায়ণগঞ্জে অল ইস্ট বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স বা পূর্ববঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে শাস্ত্রীসংগীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'ওস্তাদ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। বাংলার গভর্নরের কুমিল্লা সফর উপলক্ষে এক সংগীত সভার আয়োজন করা হয়, তাতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এ অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীসংগীত পরিবেশন করে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেন। এ সময় থেকেই বিশ্বখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।



১৯৩৮ সালে তিনি কোলকাতায় বদলি হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে তাঁর সংগীত চর্চা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। ‘নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন’ ও ‘নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন’ এ বিচারকের দায়িত্ব পালন ছিল তাঁর গভীর সংগীত জ্ঞানের স্বীকৃতি। সেসব সম্মেলনে তিনি নিজেও সংগীত পরিবেশন করেন। ১৯২২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কবি ওস্তাদ খসরুর কাছে বহু রাগ-রাগিণীর তালিম নেন। বিভিন্ন গানে সুরারোপের ক্ষেত্রে তিনি কবিকে সহায়তা করেন। নজরুলের কয়েকটি গানে তিনি সুরারোপ করেন এবং নিজে দুইটি নজরুলের গান রেকর্ড করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বেতারে তিনি সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বেতারে তিনি নিয়মিত শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমির (বাফা) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ও ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট শ্রেণির সংগীত বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করেন।

বিশ্ববরেণ্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর সংগীত পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে হোসেন খসরুকে ‘দেশমণি’ উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। ১৯৫৪ সালে ওস্তাদ খসরু করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন। তিনি ৬ আগস্ট ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুকে মরণোত্তর ‘প্রাইড অব পারফরমেন্স’ সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মরণোত্তর ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি’ পদকে ভূষিত হন। কৃতী গায়ক, শাস্ত্রীয়সংগীতে পণ্ডিত মোহাম্মদ হোসেন খসরু স্মরণীয় হয়ে আছেন।

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

যেসব মহান ব্যক্তির কথা স্মরণ করে বাঙালি মাত্রই গর্ব অনুভব করে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে বিশ্বের কাছে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সংগীতকার, কণ্ঠশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সমাজসেবক।

কোলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারে সবাই ছিলেন সুশিক্ষিত, সুরচিসম্পন্ন, কুসংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিসেবী। সেখানে সাধারণ শিক্ষাচর্চার পাশাপাশি কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নাট্যকলা ও চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত চর্চা হতো। এমনি এক উন্নত পরিবার ও পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথও বহু প্রতিভা ও গুণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের সমঝদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগসংগীতের, বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের অনুশীলন করতেন। বাংলার নিজস্ব বাউল, কীর্তন, প্রভৃতি গানের প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেকালের অনেক বিখ্যাত সংগীতগুণি এই ঠাকুর পরিবারে সাদরে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, মওলা বখশ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীতসূত্রে তখনকার বহু গুণিজনের আগমন ঘটত এই পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই ভাই গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীতে দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী ছিলেন আরেক প্রতিভাময়ী সংগীতশিল্পী। বলা যায়, ঠাকুর পরিবারের প্রায় সবার মধ্যেই সংগীতের চর্চা ছিল। এমন এক সাংগীতিক পরিবেশের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর খুব বেশি করেই পড়েছিল। বাল্য বয়স থেকেই তাঁর সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। অল্প বয়স থেকেই তিনি সুগায়ক হয়ে ওঠেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সংগীত রচনা করতে শুরু করেন ও সুনাম অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গান 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে পরিচিতি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ও প্রশিক্ষণে গান রচনার কাজে হাত দেন। তাঁর সত্যিকারের সংগীত রচনা শুরু হয় বিশ বছর বয়স থেকে। তারপর জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ আশি বছর বয়স পর্যন্ত গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। এই গানগুলি গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত আছে।



শাস্ত্রীয়সংগীত থেকে গুরু করে লোকসংগীত পর্যন্ত গানের যত প্রকার ধারা বা শৈলী আছে তার প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয়সংগীতের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরি এবং বাংলাগানের ভাটিয়ালি, সারি, বাউল, কীর্তন, পাঁচালি প্রভৃতি আঙ্গিকের গান পাওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারে। এছাড়াও তার মধ্যে পাওয়া যাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ যথা— পাঞ্জাব, মহীশূর, চেন্নাই, (মাদ্রাজ) গুজরাট, লক্ষ্মৌ, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশের গানের রীতি ও সুরভঙ্গি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগেও তিনি কিছু গান রচনা করেন।

উপমহাদেশের মার্গ ও দেশসংগীতে ব্যবহৃত তালসমূহের অধিকাংশই, যেমন— চৌতাল, ত্রিতাল, একতাল, ধামার, সুরফাঁক তাল, বাঁপতাল, আড়াঠেকা, কাওয়ালি, কাহারবা, তেওড়া, দাদরা, রূপক ইত্যাদি তাল রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত কিছু তাল-ছন্দ, যেমন— ষষ্ঠি, ঝম্পক, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চতাল ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমুদয় গানকে অর্থাৎ গীতবিতানকে মোটামুটিভাবে ছয় ভাগে, ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে গেছেন। পর্যায়েগুলো হচ্ছে— পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র। কিন্তু উল্লিখিত পর্যায়ের মধ্যে ফেলা হয়নি এমন বহু গান আছে— পরিশিষ্ট, প্রেম ও প্রকৃতি, জাতীয়সংগীত, নাট্যগীতি ইত্যাদি শিরোনামে। বিষয়, রস, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিচারে তাঁর গান বহু বিচিত্র। আরাধনার গান, উদ্দীপনার গান, হাসির গান, উপলক্ষের গান, স্বাতুর গান, শিশু-কিশোরদের গান প্রভৃতি অনেক প্রকার গান রচনা করেছেন।

পৃথক পৃথকভাবে গান রচনা ছাড়াও তিনি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। তাঁর তিনটি গীতিনাট্যের নাম হলো: বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ারখেলা ও কালমৃগয়া। তিনটি নৃত্যনাট্যের নাম হলো: চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা। গীতিনাট্যগুলোতে আছে সংলাপ আকারে গানের সমাবেশ। আর নৃত্যনাট্যগুলোতে ঘটেছে নৃত্যাভিনয়ের পরিপূরক হিসেবে গানের সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ অনেক মঞ্চনাটক রচনা করেন, সেগুলোর প্রযোজনা করেন এবং তার কোনো কোনোটিতে অভিনয়ও করেন। এসব মঞ্চনাটকের মধ্যেও বহু গান আছে।

১৯০১ সালে তিনি বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্তিনিকেতন নামে এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে সেখানে ‘বিশ্বভারতী’ নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯১৩ সালে তিনি তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়।

বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট আশি বছর বয়সে এই মহান পুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

বিশ্বকবি, মহান সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অগাধ সৃষ্টিকর্ম দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংগীত ভূবনকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর গান গেয়ে মানুষ উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” রবীন্দ্রনাথের রচনা।

## কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যের অনন্য সাধারণ কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, শিল্পী ও সুরস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। এই অমিত প্রতিভাধর কবি (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ অনুযায়ী ১৩ মোহররম ১৩১৭ হিজরি ২৪মে ১৮৯৯ সালে) জন্মগ্রহণ করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, মাতা কাজী জাহেদা খাতুন। চার ভাই-বোনের ভিতর কবি ছিলেন দ্বিতীয়। বড়ো ভাই কাজী সাহেবজান, দ্বিতীয় কাজী নজরুল ইসলাম, তৃতীয় কাজী আলি হোসেন এবং বোন কাজী উম্মে কুলসুম। কথিত আছে, চার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর কবির জন্ম হওয়ায় সবাই তাঁকে ‘দুখু মিঞা’ বলে ডাকত। আবার অনেকে বলেন শিশুকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সেই কারণেই তাঁকে ‘দুখু মিঞা’ বলে ডাকা হতো। মাত্র নয় বৎসর বয়সে ৭ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১৬ সফর ১৩২৬ হিজরি ২০ মার্চ ১৯০৮ সালে নজরুলের পিতার মৃত্যু হয়। ফলে সংসারে দারিদ্র্য চরমে ওঠে। এ সময়ে নজরুল গ্রামের মক্তবের ছাত্র ছিলেন। এই মক্তব থেকেই তিনি প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্য আর সাংসারিক অশান্তির কারণে তার স্বাভাবিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সংসার চালাবার জন্য মাত্র দশ বৎসর বয়সে বালক নজরুলকে মক্তবে শিক্ষকতা করতে হয়। শুধু তাই নয়, মসজিদে ইমামতি, মাজার শরিফে খিদমতগিরি, গ্রামে মোল্লাগিরি করতে হয় অর্থ উপার্জনের জন্য। অত্যন্ত সং ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে পিতার ধর্মপরায়ণতা, সততার দ্বারা বাল্যকালেই নজরুল প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতেও তা অটুট ছিল। নজরুলের স্বাভাবিক পড়াশোনা বাধাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা থেমে থাকেনি। স্কুলের বিধিবদ্ধ পড়াশোনার বাইরে যাকিছু শিক্ষণীয় সবকিছুই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। কবি আরবি ও ফারসি ভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন মক্তবের শিক্ষক কাজী ফজলে আহমদের কাছে। তার পিতৃত্ব (পিতার চাচাত ভাই) বজলে করিম ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর সাহচর্যে কবি আরবি ও ফারসি মিশ্রিত বাংলা কাব্য রচনা শুরু করেন। উক্ত ভাষা ও সাহিত্যচর্চা, ইমামতি, খিদমতগিরি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ নতুন ধারার ইসলামি সংগীত বিশেষভাবে গজল গানে যথোপযুক্ত আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ প্রয়োগে সহায়তা করে।

কবি মাত্র বারো বছর বয়সে অর্থ উপার্জনের জন্য ‘লেটো’ দলে যোগ দেন। লেটোগান, কবি ও যাত্রা সম্বলিত এক প্রকার গীতি। দুই দলের মধ্যে কবিতা ও গানের মাধ্যমে যেকোনো একটি বিষয়কে ভিত্তি করে লড়াই, এর প্রধান উপজীব্য। কবি প্রাথমিকভাবে খুব সাধারণ অবস্থায় লেটো দলে যোগ দিলেও খুব কম সময়ের মধ্যেই নিজ প্রতিভাবলে দলের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদ পদটি অধিকার করে নিয়েছিলেন। ওস্তাদ হওয়ার সুবাদে তাঁকে প্রায়ই দলের অনুরোধ মতো বিভিন্ন বিষয়ে লেটো গান লিখতে হয়েছে। যার ফলে তিনি পরবর্তীকালে ভক্তীগীতি ও বিভিন্ন ফরমায়েসী সংগীত রচনায় অনায়াসে সাফল্য লাভ করেন।

সদাচঞ্চল কবি কোনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতেন না। কাজেই এখানেও ব্যতিক্রম ঘটলো না। হঠাৎ করেই লেটোদল ছেড়ে বর্ধমানের মাথরুল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। শিক্ষক ছিলেন কবি কমুদরঞ্জন মল্লিক। কিছুদিনের মধ্যেই আর্থিক অনটনের কারণে আবার স্কুল ত্যাগ করেণে। এরপর কিছুদিন বাসুদেবের সখের কবিগানের আসরে ঢোলক বাজিয়ে গান করেছিলেন। এই সময় তিনি পালাগান, স্বরচিত কবিতায় সুরারোপ করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়টি পরবর্তীকালে স্বনামধন্য সুরকার ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করে।



একদিন এই সখের কবিগানের আসরে নজরুলের গান শুনে এক খ্রিষ্টান গার্ড সাহেব মুগ্ধ হন এবং তাকে বাবুটির কাজ দিয়ে তার প্রাসাদপুরের বাংলায় নিয়ে যান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই গার্ড সাহেবের দেওয়া চাকরি ছেড়ে আবার চলে আসেন আসানসোল। এবার তিনি চাকরি নেন এম-বক্শের চাকরির দোকানে। বিনা পয়সায় খাওয়া দাওয়াসহ বেতন ছিল মাসে এক টাকা। কিন্তু থাকার কোনো জায়গা ছিল না। সারাদিন পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত নজরুল পাশের একটি তিন তলা বাড়ির নিচে ঘুমিয়ে থাকতেন। ঐ বাড়িতে কাজী রফিজউল্লাহ নামে পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর থাকতেন। তিনি কবিকে পাঁচ টাকা বেতনে গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। কাজী রফিজউল্লাহ এবং তার স্ত্রী নজরুলকে খুব স্নেহ করতেন। তাদের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার কাজীর শিমলা গ্রামে। তারা কবি নজরুলকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং দরিরামপুর হাই স্কুলে সন্তুষ্টি শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এখানেও কবি মাত্র কয়েক মাস থাকেন এবং বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে যান। তারপর আবার তিনি রাণিগঞ্জ চলে যান এবং শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তার মেধা ও প্রতিভার পুরস্কার হিসেবে রাজ পরিবার থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি ও বিনা খরচে ছাত্রাবাসে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পান। এখানে কবির পরিচয় ঘটে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর সাথে এবং অচিরেই এই পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

কবি শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন হাফিজ নুরুল্লাহ সাহেবকে। তিনি নজরুলের মেধা, কাব্যপ্রীতি ও ফারসি ভাষায় দখল দেখে মুগ্ধ হন এবং স্কুলে তাঁর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ছাড়িয়ে ফারসি পড়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে নজরুলের ফারসি ভাষায় জ্ঞান, ফারসি সাহিত্য পড়া এবং তাঁর কবিতায় ব্যবহার সবকিছুতেই সেই শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। সংগীতের প্রতি কবির আগ্রহ ছিল প্রথম থেকেই। উক্ত স্কুলে আরও একজন শিক্ষক ছিলেন শ্রী সতীশ চন্দ্র কাজীলাল। শাস্ত্রীয়সংগীতে তার যথেষ্ট দখল ছিল। উক্ত শিক্ষকের সাহচর্যে এসে কবির সংগীতের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। সতীশচন্দ্র অত্যন্ত যত্নের সাথে কবিকে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম দিতে থাকেন। কিন্তু সদাচঞ্চল কবি এখানেও বেশিদিন থাকতে পারলেন না।

প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর চারিদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড় চলছিল। অর্থের প্রয়োজনে কবি বাধ্য হয়ে ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোরের নৌশরাতে চলে যান। সেখানে তিন মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর তিনি করাচি সেনানিবাসে চলে যান। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি সেনা বিভাগে চাকরি করেন এবং হাবিলদার পদে উন্নীত হন। সৈনিক জীবনের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও নজরুলের সাহিত্য চর্চা থেমে থাকেনি বরং প্রকৃত সাহিত্যচর্চা এখানেই শুরু হয়। তাঁর প্রথম গল্প 'বাউলুলের আত্মকাহিনি', প্রথম কবিতা 'মুক্তি' এখানেই রচিত হয়। এই সময় তাঁর পরিচয় ঘটে এক পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেবের সাথে। তিনি ফারসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। পূর্বে নজরুলের ফারসি জানা থাকার কারণে মৌলভী সাহেবের কাছে বিখ্যাত পারস্য কবিদের অমূল্য কাব্যগ্রন্থ পাঠের সুযোগ পান। পরবর্তীকালে নজরুল হাফিজের গজল ও রুবাইয়াত এর অনুবাদ করেন এবং ১৯৩০ সালে অনুবাদগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।



যুদ্ধের পর বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো। নজরুল সোজা চলে এলেন কোলকাতায় বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর বাড়িতে। পরে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে চলে আসেন এবং সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মী মুজাফফর আহমদকে বন্ধু এবং একমাত্র সাথি হিসেবে পান। প্রকৃতপক্ষে এখানেই নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নজরুলের কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামের আলি আকবর খান নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং তার অনুরোধে হঠাৎ করে কুমিল্লা এসে হাজির হন। সেটা ছিল ১৯২১ সালের এপ্রিল ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। সেখানে কয়েক মাস থাকার পর ১৩২৮ সালে ৩ আষাঢ় ১৯২১ সালের ১৭ জুন শুক্রবার আলি আকবর খান সাহেবের ভাগ্নী নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বিবাহ আদৌ সুখের হয়নি। এমনকি বিয়ের দিনগত রাতেই কবি দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লা চলে আসেন। সেখানে বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারে তিনি অত্যন্ত আদরের সাথে কিছুদিন বাস করেন। তারপর নজরুলের অকৃত্রিম বন্ধু মুজাফফর আহমদ তাঁকে কোলকাতা ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তালতলা লেনের এক বাড়িতে বসবাস শুরু করেন, সেখানেই লিখেছিলেন তাঁর চিরস্মরণীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা মোসলেম ভারত পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'সাপ্তাহিক বিজলী'র মাধ্যমে। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধীমহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সারা বাংলায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাইশ বছর বয়সের এক তরুণের পক্ষে এমন বলিষ্ঠ কবিতা লেখা সত্যিই অবিদ্বাস্য ব্যাপার। নজরুল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার ও সাংবাদিকতার কাজ করেন। যেমন—দৈনিক নবযুগ, সেবক এবং মোহাম্মদীতে সাংবাদিকতা ও 'ধূমকেতু', 'লাঙল' 'গণবাণী' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে 'ধূমকেতু' পত্রিকা সে সময়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি তথা ভারতবাসীদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯২২ সালের ধূমকেতু পূজা সংখ্যায় নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি এবং 'ধূমকেতু' ইংরেজ সরকারের কোপানলে পড়ে এবং উক্ত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুধু তাই নয় উক্ত অপরাধে নজরুলকে প্রেস্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। হুগলী জেলে থাকাকালে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ (উনচল্লিশ) দিন অনশন ধর্মঘট করেন। এই অনশনের পর নজরুলের খ্যাতি আরও বেড়ে যায়। এই সময় ১০ মাঘ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বসন্ত' নাটকটি কবি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন।

তারপর ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ অনুযায়ী ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কুমিল্লার গিরীবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য নজরুল সমগ্র দেশবাসীকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজীবন দারিদ্র্য আর প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও তিনি শোষণ, অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তৎকালীন কোলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল সক্রিয়ভাবে লেখনী ধরেন। রচনা করেছেন অসংখ্য মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক গান।

কবি নজরুল হুগলীতে থাকাকালে তার প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তার অকাল মৃত্যু ঘটে। এরপর ১৯২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম হয় কৃষ্ণনগরে এবং তার নামানুসারে তার সংগীত গ্রন্থের নামকরণ করেন 'বুলবুল'। এই সময় নজরুল গজল গান রচনায় মেতে ওঠেন এবং বেশকিছু অসাধারণ গজল গান রচনা করেন।

নজরুলের যশখ্যাতি যেমনভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সে তুলনায় মোটেও তার অর্থ প্রাপ্তি ঘটেনি। এর কারণ হয়ত তার শিশুর মতো সরল মন। অনেকেই তাকে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু তিনি তার সামান্যই ভোগ করতে পেরেছেন। এই নিদারুণ অর্থ কষ্টের ভিতর ১৯৩৭ সালের ২৪ বৈশাখ ইংরেজি ১৯৩০ ফর্ম-৩, সংগীত, ৭ম শ্রেণি

সালের ৭ মে বুধবার পুত্র বুলবুল বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই মৃত্যু কবির মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি এক আধ্যাত্মিক গৃহযোগী বরোদাচরণ গুপ্তের সান্নিধ্যে আসেন। কিছুদিন নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর তিনি মানসিক শান্তি লাভ করেন। তাঁর বিশৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এই সময়ে নজরুল বেশকিছু অসাধারণ শ্যামাসংগীত ও ভক্তিগীতি রচনা করেন।

তার অসাধারণ কাব্যগ্রন্থের ভিতর কয়েকটির নাম: ব্যথার দান, অগ্নিবীণা, যুগবাণী, দোলনচাপা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, রিক্তের বেদন, ঝিঙে ফুল, পূবের হাওয়া, ছায়ানট, সিদ্ধু হিল্লোল, সর্বহারা, ফণি-মনসা, বাঁধনহারা, জিজির, বুলবুল, চক্রবাক, সন্ধ্যা, প্রলয়-শিখা, কুহেলিকা ইত্যাদি। ১৯২৮ সালে নজরুল গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। এসময় কবি সংগীত চর্চা ও গবেষণায় মগ্ন হয়ে যান।

তিনি ছায়াছবি ও রঙ্গমঞ্চের সাথেও যুক্ত হন এবং কয়েকটি ছায়াছবিতেও অভিনয় করেন। আলেয়া, বিদ্যাপতি, সাপুড়ে, মল্লয়া প্রভৃতিতে গীত রচনা, সুর ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কবি বেতারের সঙ্গে যুক্ত থেকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উপহার দেন। ১৯৪০ সালের দিকে কোলকাতা বেতার থেকে 'হারামণি ও নবরাগমালিকা' নামে দুইটি অনুষ্ঠান তার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে কবি অনুভব করেছিলেন তার অসুস্থতার কথা। এর কিছুদিন পর তার স্ত্রী প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এই সময়টি নজরুলের জীবনে সবচেয়ে দুঃসময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নিদারুণ অর্থকষ্ট, স্ত্রীর অসুস্থতা কবিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। এই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধহয় আর সহ্য করতে পারেননি কবি। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। প্রায় দশ বৎসর পর ১৯৫২ সালের ২৭ জুন নজরুল সমিতি গঠিত হয়।

কবিকে প্রথমে রাঁচি সেন্ট্রাল হাসপাতালে পাঠিয়ে কিছুদিন চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। শেষে ১৯৫৩ সালের ১০ মে সস্ত্রীক কবিকে লন্ডন পাঠানো হয়। তারপর ভিয়েনা। সেখানকার ডাক্তারগণ কবির অসুস্থতা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে আরোগ্য লাভের কোনো আশা বলে নেই অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে ১৫ ডিসেম্বর কবিকে পুনরায় কোলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়।

কবি নির্বাক হয়ে যাওয়ার পর ১৯৪৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত করে।

কবি পত্নী প্রমীলা নজরুল ১৯৬২ সালের ৩০ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারত সরকার এই লোকপ্রিয় কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার অনুমতি দেন। তারপর ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে ঢাকা আনা হয় এবং ২৫ মে দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কবির ৭৩তম জন্মদিন পালন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার, দেশের সকল মানুষ তাঁকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করলেন। অপরিসীম শ্রদ্ধায় সরকার ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে কবিকে নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত করেন। এছাড়াও



১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের মানুষ তাকে আমাদের জাতীয় কবির মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ১৩৮৩ বাং সালের ১২ ভাদ্র রবিবার তৎকালীন ঢাকা পি জি হাসপাতালে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

#### কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত জীবন

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুণিজনের সাহচর্যে আসেন এবং সংগীত চর্চা করেন। কিশোর বয়সে অর্থের প্রয়োজনে লেটো দলে যোগ দিয়ে দলপতির কাছে গান শিখে আবার অন্যদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর প্রতিভা ও অনুশীলনের ফলে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে তিনি লেটো দলের দলপতির পদে উন্নীত হয়ে দায়িত্বপালন করেন। এই সময় তিনি হারমোনিয়াম, বাঁশি ও তবলা বাদনে সবিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তারপর শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন উক্ত স্কুল শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র কাজিলালের কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম নেন। এছাড়াও কবি মুর্শিদাবাদের তৎকালীন প্রখ্যাত ওস্তাদ কাদের বক্স এবং মঞ্জু সাহেবের কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম নেন। চুঁচুড়ার প্রখ্যাত সেতার বাদক প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাছে কিছুদিন সেতার শেখেন। এছাড়া নজরুল বিশেষভাবে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম নেন তৎকালীন প্রখ্যাত সংগীতগুণি গ্রামোফোন কোম্পানির সংগীত প্রশিক্ষক ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর কাছে। নজরুলের সংগীত চর্চা ও গবেষণা বাংলাগানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলায় গজল গান ও ইসলামি সংগীতের তিনিই প্রবর্তক। প্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর চর্চা ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রাচীন কয়েকটি ছন্দের প্রচলন ও নবনন্দন নামে একটি তাল সৃষ্টি করেন। কবিসৃষ্ট কয়েকটি রাগের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো। যেমন: রাগ— বেণুকা, উদাসী ভৈরব, অরুণভৈরব, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, নির্ঝরিনী, অরুণরঞ্জনী, দোলনচাঁপা, আশাভৈরবী ইত্যাদি। নজরুল যে সকল সংস্কৃত ছন্দ তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন সেগুলো হলো: প্রিয়া (৭ মাত্রা) মনিমালা (২০ মাত্রা) মঞ্জুভাষিনী (১৮ মাত্রা) স্বাগত (১৬ মাত্রা)।

বাংলাগানে কবি নজরুল যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাগানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে কবির বিচরণ ছিল না। ফরাদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, কাজরি, গজল, দেশাআবোধক, হাসির গান, ইসলামি, জাগরণী, ভাটিয়ালি, ছাত্রদলের গান, মার্চ সংগীত, শ্যামা সংগীত, ঝুমুর, কীর্তন, বাউল, ভজন সকল পর্যায়ের গান রচনা করে কবি বাংলাগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। নজরুল তিন হাজারেরও অধিক গান রচনা করে গেছেন। এককভাবে কোনো গীতিকবি ও সুরকারও এত বিপুল সংখ্যক গান রচনা করেননি। বাংলাগানের ইতিহাসে নজরুলের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

#### জসীমউদ্দীন (১৯০৩—১৯৭৬)

পল্লি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তথা গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপকার কবি জসীমউদ্দীন। গ্রাম বাংলার চিত্র তাঁর কবিতায় এমনভাবে প্রতিফলিত, যে জন্য পল্লিকবির সম্মানিত আসনটি তাঁর।



পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের জন্ম ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি। তার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের অনতিদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। পিতার নাম মৌলভি আনসারউদ্দীন। তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক। বাল্যকালে জসীমউদ্দীন ছিলেন খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। গাঁয়ের ছেলেদের সাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে বনে বাদাড়ে, নদীতীরে। জসীমউদ্দীন যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তেন তাঁর পাঠশালার সাথে এক বন্ধুর বাড়িতে তখন কোলকাতা থেকে নিয়মিত 'সন্দেশ' এবং অন্যান্য পত্রিকা আসত। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে এসব পত্রিকা পড়তেন এবং তাঁর দারুণ ভালো লাগত।

কবি ফরিদপুরের হিতৈষী স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন ফরিদপুর জেলা স্কুলে। এই স্কুলে থাকতেই জসীমউদ্দীনের মধ্যে কবিতা লেখার নেশা জেগেছিল। কিন্তু কবির মনে হলো এই সুদূর গ্রামে পড়ে থাকলে কবি হওয়া যাবে না। তাই তাঁকে কোলকাতা যেতে হবে। মিশতে হবে বৃহত্তর গুণি সমাজের সাথে। তিনি কোলকাতায় চলে এলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো জাতীয় মঙ্গলের কবি মোজাম্মেল হক ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। নজরুল কিশোর জসীমউদ্দীনের কবিতায় নতুন ভাবধারা উপলব্ধি করলেন এবং কবিতার জগতে সর্বত্র সহায়তা ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দিলেন। এভাবেই কোলকাতায় কাটলো তার কিছুদিন। কবির মনে অন্য বাসনা জাগলো পড়ালেখা করতে হবে- প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে; তবে না সার্থক কবি হওয়া যাবে। এমন বাসনা নিয়ে ফিরে এলেন ফরিদপুরে। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলেন। তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যান কোলকাতায়। দেশে আই এ পড়ার সময়েই তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন এর সহযোগিতায় একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। এ বৃত্তি ছিল পল্লি অঞ্চলের গান, গাঁথা, পুঁথিকাব্য সংগ্রহ করার কাজ। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এসব সংগ্রহ করতেন। তার বিনিময়ে পেতেন মাসে ৭০ টাকার বৃত্তি। তিনি এমএ পাশ করার সময় পর্যন্তও এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোলকাতায় তাঁর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে ড. দীনেশচন্দ্র সেনেরই অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনিই কবির প্রথম কাব্য 'নকশী কাঁথার মাঠ' প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দেন এবং কবির 'কবর' কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করান। তখন জসীমউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যখন পত্রিকায় জসীমউদ্দীনকে নিয়ে 'A Young Muslim Poet' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন তখন জসীমউদ্দীনের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

কোলকাতায় পড়ার সময়ই তাঁর পরিচয় ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে এবং প্রথম পরিচয় হয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। তারপর পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময় প্রকাশিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' এবং 'রাখালী' কাব্য পাঠ করে জসীমউদ্দীনের কবি প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ একটি বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন এবং সেই সংকলনে জসীমউদ্দীনের 'রাখালী' কাব্যের অন্তর্গত 'উড়ানীর চর' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এটা ছিল জসীমউদ্দীনের জন্য কবি হিসেবে বিশ্বকবি কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ এবং বিরল সম্মান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি প্রায়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসতেন। এভাবে একদিন তাঁর পরিচয় হয় গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রভাতকুমারের বাড়িতে নিয়মিত গল্পের আসর বসত। জসীমউদ্দীন ছিলেন সে আসরের একজন সদস্য। প্রভাত কুমারের এক মেয়ের নাম ছিল 'হাসু'। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে হাসু। তার সঙ্গে কবির খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। আর ছড়া গান শোনাতেন। পরে এই হাসুকে নিয়েই তিনি লিখেছিলেন একটি ছড়ার বই 'হাসু'।

জসীমউদ্দীন ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ সালে কবি প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগে সং পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি প্রচার বিভাগে চাকুরি করেন এবং ওখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। কবি জসীমউদ্দীন লোকসাহিত্যের আজীবন প্রবক্তা ছিলেন। বহু আন্তর্জাতিক লোকসাহিত্য সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৫০ সালে কবি আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা এবং ১৯৫১ সালে যুগোস্লাভিয়া যান। ১৯৫৬ সালে ‘নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য’ সম্মেলনে লোকসংস্কৃতির শাখার সভাপতি হয়ে ইয়াদুন (রেঙ্গুন) ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি সারা জীবন কাব্য সাধনা করে গেছেন সাধকের মতো। পল্লির মানুষ ও তাদের সরল জীবনই ছিল কবির কাব্য সাধনার বিষয়বস্তু।

জসীমউদ্দীন রচিত কাব্য ‘রাখালী’, ‘নকশী কাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ ‘হাসু’, ‘বালুচর’, ‘ধানক্ষেত’, ‘রঙ্গিলা নায়ের মাঝি’, ‘রূপবতী’, ‘পদ্মাপার’, ‘এক পয়সার বাঁশি’, ‘মাটির কান্না’, ‘সখিনা’ এবং ‘বেদের মেয়ে’ (নাটক) বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তার ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ‘চলে মুসাফির’ তাঁর রচিত অন্যতম ভ্রমণ কাহিনি।

কবি জসীমউদ্দীন পল্লিকবি হিসেবে যেমন বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার সুসমামণ্ডিত করেছেন ঠিক তেমনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা লোকসংগীত। তাঁর লেখা ও সুরে ভাটিয়ালি, মারফতি, মুর্শিদি প্রভৃতি গান আব্বাসউদ্দিন আহমেদ কোলকাতার ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’ এবং ‘গ্রামোফোন কোম্পানি’তে রেকর্ড করেন। এছাড়াও তাঁর লেখা গান অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীই গেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবদুল আলীম, মোস্তফা জামান আব্বাসী, ফেরদৌসী রহমান, ফওজিয়া ইয়াসমীন, সোহরাব হোসেন, বেদার উদ্দীন আহমেদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, বিপুল ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ পল্লিকবি জসীমউদ্দীন ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

### আব্বাসউদ্দিন আহমেদ (১৯০১—১৯৫৯)

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর কুচবিহার থেকে বারো মাইল দূরে বলরামপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মা হিরামুন্নেসা ও বাবা তৎকালের খ্যাতনামা উকিল ও জমিদার জাফর আলী আহমেদ। বাবার ইচ্ছে আব্বাসউদ্দিনও হবে বড়ো উকিল, ব্যারিস্টার। কিন্তু ছোট্ট আব্বাসের মন শুধু গানের দিকে। বাড়ি থেকে লুকিয়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে যাত্রা গান, পালা গান শুনে বেড়াতেন। তিনি যে শুধু গানেই মাতোয়ারা ছিলেন তা নয় পড়াশোনাতেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ক্লাসের পরীক্ষাতে বরাবরই প্রথম হতেন। তিনি ম্যাট্রিক এবং আই এ পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। সে সময়ে সবাই আব্বাসউদ্দিনকে কোলকাতা যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন যাতে সেখানে গিয়ে রেকর্ডে গান গেয়ে তিনি আরো বড়ো শিল্পী হতে পারেন। এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে কুচবিহারের কলেজে মিলাদ মাহফিলে এবং পরে দার্জিলিং- এর এক গানের অনুষ্ঠানে। তিনি কোলকাতা গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন দুইটি গান।

আব্বাসউদ্দিন রেকর্ডে গান করতে এসে পরিচিত হন তখনকার দিনের খ্যাতনামা শিল্পী কে মল্লিকের সাথে। কথায় কথায় জানতে পারলেন কে মল্লিকের আসল নাম কাসেম মল্লিক। তিনি আসল নাম ব্যবহার না করে এ নামে রেকর্ড করেছেন প্রচুর শ্যামাসংগীত, ভজন, যাতে লোকে বুঝতে না পারে তিনি একজন মুসলমান গায়ক কিন্তু



আব্বাসউদ্দিনকে তার নাম পাণ্টাবার জন্য অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের নামই ব্যবহার করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তার গাওয়া প্রথম রেকর্ডের গান দুইটি ছিল আধুনিক-‘কোন বিরহীর নয়ন জলে’ এবং অপর পৃষ্ঠায় ‘স্মরণ পারের ওগো প্রিয়’। এই গানগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায় এবং আব্বাসউদ্দিন আরো গান রেকর্ড করার আমন্ত্রণ পান। ইতোমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে গান গাইবার জন্য তাঁর ডাক আসতে থাকে এবং কোলকাতার সংগীত জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেন। এ সময়ই তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ পান। কবি তার জন্য অনেক আধুনিক প্রেমের গান লেখেন যেমন, ‘শ্লিষ্ট শ্যাম বেণী বর্ণা’, ‘আসিবে তুমি জানি প্রিয়’ ইত্যাদি।

আব্বাসউদ্দিনের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন তাঁর প্রথম ইসলামী গান “ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ”। ঈদুল ফিতরের সময় যখন এ গান বাজারে বের হলো তখন সমস্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এভাবে মুসলমানদের ঘরে সুরের জাদু ছড়াতে থাকেন আব্বাসউদ্দিন। নজরুল আরো প্রচুর গান লেখেন এবং আল্লা-রাসুলের গান গেয়ে আব্বাসউদ্দিন বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগালেন এক নব উদ্দীপনা।

সে সময় তিনি কবি গোলাম মোস্তফার গানও অনেক গেয়েছেন। তিরিশ দশকের শেষের দিকে এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মতো মানুষের জনসভায় আব্বাসউদ্দিনের গান না হলে চলত না। সে সময় মাইক্রোফোন ছাড়াই শিল্পী হাজার হাজার জনতাকে তাঁর গান দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন।

আব্বাসউদ্দিনের আরেকটি বিরাট কাজ হলো গ্রাম বাংলার অবহেলা অনাদরে ছড়িয়ে থাকা ধূলোমাখা সম্পদ পল্লিগীতিকে তিনি নিয়ে এলেন শহুরে মানুষের কাছে। মাটির গান, মাঝি-মাল্লার গান, চাষি-মজুরের গান ধরে রাখেন রেকর্ডে। এ সময় আব্বাসউদ্দিন এবং জসীমউদ্দীন একসঙ্গে রেকর্ড করেন অপূর্ব সুন্দর সুরে পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদি যা বাঙালি মানুষের মন নিমেষেই কেড়ে নেয়। আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে বাজালেন বিশিষ্ট দোতারাবাদক কানাইলাল শীল। এসব গান স্থান পায় বাংলার ভদ্র সমাজে যা ছিল অবহেলিত, অনাদৃত। আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে বেজে ওঠে ‘নদীর কূল নাই কিনার নাই’ এবং আরো অনেক গান যা সব স্তরের মানুষকে করেছিল মাতোয়ারা।

আব্বাসউদ্দিন উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানকেও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ‘ওকি গাড়িয়াল ভাই’, ‘কিসের মোর বাঁধন কিসের মোর বাড়ি’, ‘তোরা নদীর উথাল পাখাল’ প্রভৃতি ভাওয়াইয়া গানকে তিনি কুড়িয়ে আনেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং রেকর্ড করেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিল্পী ঢাকায় চলে আসেন এবং সরকারি চাকরি নেন। তিনি দেশের প্রতিনিধি হয়ে মায়ানমার (বার্মা), হংকং, ম্যানিলা, জার্মানি প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন উৎসবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। পরাধীন দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান এবং জাগরণী গান গেয়েছেন।

আব্বাসউদ্দিন একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনে গ্রামের মানুষের মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তাঁর গাওয়া ‘ওঠরে চাষী জগতবাসী ধর কষে লাঙ্গল’ গানটি সে সময় গ্রামের মানুষের মনে দেশকে স্বাধীন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

১৯৫৯ সালে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

### হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম একটি বিদেশি যন্ত্র। এটি আবিষ্কার করেন জার্মানির ড. বেইন। গান শিখতে হলে প্রথমে হারমোনিয়ামের প্রয়োজন হয়। কারণ সংগীত শিক্ষা করার প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর জন্য সাহায্যকারী যন্ত্রের প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমেই একটি সুরেলা হারমোনিয়াম প্রয়োজন। কারণ হারমোনিয়াম শিক্ষার্থীকে সুর চেনাতে সাহায্য করে। হারমোনিয়াম সাধারণত ৪৪০ কম্পন সংখ্যার মান (Standard) এ সুর করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে গান করার সময় হারমোনিয়াম প্রয়োজন। কণ্ঠ কিছুটা সুরে বসার পর তানপুরা নিয়ে চর্চা করার অভ্যাস করা উচিত। তানপুরা নিয়ে চর্চা করলে ধীরে ধীরে সুরের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়, কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণে আসে।

### হারমোনিয়ামের পরিচিতি



চিত্র: হারমোনিয়াম

সংগীত শেখার সময় সহযোগী যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়ামের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গ হারমোনিয়াম সবচেয়ে উপযোগী। এই হারমোনিয়াম প্রধানত দুই প্রকার। যেমন— সিংগেল রিড এবং ডাবল রিড। সিংগেল রিড হারমোনিয়ামে এক সেট রিড এবং ডাবল রিড হারমোনিয়ামে দুই সেট রিড থাকে। সাধারণত হারমোনিয়াম সাধারণত তিন অকটেভের মধ্যে হয়। হারমোনিয়ামের বেলো সঞ্চালনের মাধ্যমে সৃষ্ট বাতাসের সাহায্যে যা দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা হয় তাকে রিড বলে। হারমোনিয়ামের মূল অংশ চারটি। এগুলো হলো: বেলো (Blow), রিড, স্টপার বা চাবি এবং টপ বোর্ড।

হারমোনিয়ামে মূলত বাতাসের সাহায্যে রিডগুলো বাজানো হয়। যে অংশ দিয়ে হারমোনিয়ামে বাতাস সৃষ্টি করা হয় তাকে বেলো বলে। বেলো এক পাটি এবং একাধিক পাটিও হয়ে থাকে। সাধারণত একদিকে খুলে বাজাতে হয়। হারমোনিয়ামের যে অংশতে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে স্টপার বা চাবি বলা হয়। স্টপারগুলি বন্ধ থাকলে হারমোনিয়ামে আওয়াজ হয়না। হারমোনিয়ামের ওপরে যে টানা থাকে তাকে টপবোর্ড বলে। বাজানোর সময় লক্ষ রাখতে হবে হাতের কনুই যেন ঠানানামা না করে অথবা শরীরে না লাগে। হারমোনিয়াম বাজানো শেষ হলে বেলো টেনে ধীরে ধীরে রিড চাপ দিয়ে বাতাস বের করে দেওয়ার পর বেলোটিকে আটকে স্টপারগুলো বন্ধ করে দিতে হয়।

### হারমোনিয়ামে বিভিন্ন পর্দার পরিচিতি

হারমোনিয়ামে সাধারণত তিন অকটেভ পর্যন্ত থাকে। কারণ মানুষের কণ্ঠ তিন অকটেভের মধ্যেই সীমিত। প্রচুর সাধনার ফলে কেউ কেউ হয়ত তিন অকটেভের ওপরেও যেতে পারে।

গান গাইবার জন্য তিনটি অকটেভের বেশি স্বরের প্রয়োজন পড়েনা। হারমোনিয়ামে নিচের সাদা পর্দা থাকে মোট বাইশটি এবং কালো পর্দা থাকে মোট পনেরোটি। হারমোনিয়ামে একেবারে বাঁ দিকের শেষ পর্দাটির নাম সি। সি থেকে সি পর্যন্ত এক অকটেভ অর্থাৎ আটটি স্বর। সি থেকে বি পর্যন্ত অর্থাৎ সা থেকে নি পর্যন্ত এক সপ্তক। সি থেকে বি পর্যন্ত প্রথমে খাদ বা মন্দ্র স্বর। অর্থাৎ সপ্তকের হিসাবে উদারা সপ্তক। আবার দ্বিতীয় সি থেকে তৃতীয় বি পর্যন্ত মধ্য স্বর অর্থাৎ মুদারা সপ্তক এবং তৃতীয় সি থেকে চতুর্থ বি পর্যন্ত উচ্চ স্বর অর্থাৎ তারা সপ্তক। বোঝার সুবিধার্থে হারমোনিয়ামের তিন অকটেভ পর্যন্ত পর্দার স্কেল, পর্দার নামসহ দেওয়া হলো:



চিত্র: হারমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দার পরিচিতি

## তবলা

ডাইনা এবং বাঁয়া এ দুটিকে একসঙ্গে বলা হয় তবলা। বাঁয়া বাম হাতে বাজানো হয়। তবলা ডান হাতে বাজানো হয়। তবলা কাঠের তৈরি হয়ে থাকে এবং বাঁয়া মাটির বা তামার তৈরি হয়ে থাকে। তবলা ও বাঁয়ার মুখে যে চামড়া থাকে তাকে ছাউনি বলা হয়। ছাউনির বেড়ির মতো চামড়াকে বলা হয় বেটনী। এই বেটনী চামড়ার দড়ি দিয়ে নিচে ছোটো বেটনীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। এই চামড়ার দড়ির নাম দোয়ালি। বাঁয়াতে দোয়ালির পরিবর্তে সুতার ডুরি ব্যবহার করা হলে তাতে পিতলের আটটি রিং ব্যবহার করা হয়। রিং-এর সাহায্যে বাঁয়ায় আওয়াজ ভারী অথবা পাতলা করা যায়। ঘাটের সংখ্যা মোট আটটি। তবলায় আটটি কাঠের গুলি বা গুটি থাকে। এই গুলির সাহায্যে দোয়ালি টেনে হাতুড়ির সাহায্যে ঘাটগুলোর সুর বাঁধা হয়।



চিত্র: তবলা-বাঁয়া

তবলার ছাউনির মাঝখানে এবং বাঁয়ার ছাউনির এক পাশে গোলাকার কালো অংশকে বলা হয় গাব বা খিরণ। ছাউনির চারপাশে প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ অতিরিক্ত চামড়া ঘেরা জায়গাকে বলা হয় কানী। গাব এবং কানীর মাঝের অংশকে বলা হয় সুর বা ময়দান। খড়ের ওপর কাপড় পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় বৃত্তাকার বিড়া। তবলা-বাঁয়া দুটি বিড়ার ওপর রেখে বাজানো হয়।



## তানপুরা

তানপুরা তত জাতীয় যন্ত্র। তানপুরার আদি নাম তাম্বুরা। তাম্বুরা একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। তানপুরা যন্ত্রটির গঠন প্রকৃতি সহজ ও সাধারণ। একটি গোলাকার শুকনো লাউয়ের সঙ্গে খোদাই করা একটি কাঠের খণ্ড জোড়া লাগানো হয়। এই লম্বা কাষ্ঠ খণ্ডকে বলা হয় দণ্ড। দণ্ডের আকৃতি অর্ধগোলাকার। এই দণ্ডের ওপর আরেকটি



চিত্র: তানপুরা

অর্ধগোলাকার কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত করা হয়। পরের অর্ধ গোলাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডটিকে বলা হয় পটরী। লাউয়ের ওপর একটি কাঠের তবলীর আচ্ছাদন লাগানো হয়। তবলীর আকৃতিও ঈষৎ গোলাকার। লাউয়ের নিম্নাংশে একটি হাড়ের লেংগুট লাগানো হয়। তবলীর ওপর একটি কাঠের বা হাড়ের তৈরি সোয়ারী স্থাপন করা হয়। তানপুরার মাথার দিকে দুইটি তারগহন পটরীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। দণ্ডের দুইপাশে পটরীর মাথার দিকে দুইটি কাঠের গোল বয়লা লাগানো হয়। বয়লাতে তার আবদ্ধ থাকে। তানপুরাতে সাধারণত চারটি তার ব্যবহৃত হয়। সুর মেলানোর জন্য প্রতিটি তারে মেনকা সংযোজন করা হয়।

### বাঁশি

বাঁশি শুমির জাতীয় যন্ত্র। বাঁশ দিয়ে তৈরি বলেই এই যন্ত্রের নাম বাঁশি। বাঁশি বাজাতে হয় ফুঁ দিয়ে। বাঁশির সুর গানের বাণীকেও ফুটিয়ে তুলতে পারে। বর্তমানে বাঁশ ছাড়া পিতল, কাঠ বা মাটি দিয়েও বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশির অনেক প্রকারভেদ আছে: সরল বাঁশি, আড় বাঁশি, টিপরা বাঁশি এবং লয় বাঁশি ইত্যাদি।



চিত্র: বাঁশি

### মন্দিরা

মন্দিরা ঘনবাদ্য। কাঁসার নির্মিত দুটি বাটি দু'হাতে ধরে পরস্পরের কিনারায় মৃদু টোকা দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। বাটি দুটির তলায় মোটা সুতা বাঁধা থাকে। বাটির গা স্পর্শ না করে সুতা ধরে বাজাতে হয়। তাল, লয় ও ছন্দ নিরূপণে মন্দিরা সাহায্য করে। জারি, কীর্তন, মুর্শিদি, মারফতি, কবিগান, বিচার গান, বিচ্ছেদী প্রভৃতি গানে মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় রবীন্দ্রসংগীতেও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: মন্দিরা

## অনুশীলনী

### রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সংক্ষেপে বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ইতিহাস লেখ।
- ২। লোকসংগীতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা কর:  
(ক) জারি (খ) সারি (গ) বারোমাসি (ঘ) বিচ্ছেদী (ঙ) টুসু।
- ৩। আমীর খসরু সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।
- ৪। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর জীবনী লেখ।
- ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ।
- ৬। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী আলোচনা কর।
- ৭। জসীমউদ্দীনের জীবনী ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ৮। আব্বাসউদ্দীনের জীবনী লেখ।
- ৯। হারমোনিয়াম কে আবিষ্কার করেন? হারমোনিয়ামের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।
- ১০। তবলা-বাঁয়ার সচিত্র পরিচিতি লেখ।
- ১১। চিত্রসহ তানপুরার বর্ণনা দাও।
- ১২। নজরুলের শৈশব জীবন সম্পর্কে লেখ।
- ১৩। নজরুলের জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।
- ১৪। নজরুলের সংগীত জীবন সম্পর্কে লেখ এবং বাংলাগানে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর।
- ১৫। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান লেখ।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। তবলা-বাঁয়ার চিত্র একে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ২। বাঁশি কী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র? বিভিন্ন প্রকার বাঁশির নাম লেখ।
- ৩। মন্দিরা কী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র? মন্দিরার চিত্র একে দেখাও।



- ৪। কী কী গানে মন্দিরা ব্যবহৃত হয়?
- ৫। তবলি ও ব্রিজ কী?
- ৬। মানকা কাকে বলে?
- ৭। লেটো গান কী?
- ৮। নজরুলের পাঁচটি কাব্যছন্দের নাম লেখ।
- ৯। নজরুল কী কী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন?
- ১০। নজরুলের কয়েকজন সংগীত গুরুর নাম লেখ।
- ১১। নজরুল স্ট্র পাঁচটি রাগের নাম লেখ।
- ১২। নজরুল স্ট্র পাঁচটি তালের নাম লেখ।
- ১৩। নজরুল কত সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং কত সালে তাঁর বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হয়?
- ১৪। কী অপরাধে এবং কত সালে নজরুলকে কারাগারে পাঠানো হয়?
- ১৫। নজরুল কত সালে গ্রামোফোন কোম্পানি যোগ দেন এবং তাঁর গানের সংখ্যা কত?